প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস বনাম আধ্যাত্মিকতা

-বিপ্লব

ইদানিং লেখার সময় কমে গেছে। ফলে লিখব লিখব করেও কিছু লেখা হচ্ছিল না।

রায়হানের লেখাটার ওপর আমার একটা বক্তব্য আছে। সেটা কোরানে আছে কি না জানি না, তবে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা যেতে পারে।

রায়হান যেটা লিখল, সেটা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ। যেখানে রিচুয়াল বা ধর্মীয় আচারের কোন স্থান নেই। সেটা সত্য। গীতা বা কোরান পড়লেই পরিস্কার হয়। উভয় গ্রন্থের বক্তব্য হচ্ছে সমস্ত আচার আচরন, পূজা(/নামাজ) পরিত্যাগ করে, ঈশ্বর বা আল্লাকে আলটিমেট বস বলে আত্মসমর্পন কর। পাশাপাশি এটাও ভাবা যেতে পারে-মানুষ কে?

রক্ত মাংসের দেহ নিশ্চয় নয়। কর্মরূপেই তার স্বত্বা। তাই উভয় গ্রন্থেই মানুষের কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়।

সমস্যা হচ্ছে সৎ কর্মের সংজ্ঞা নিয়ে। বিধর্মীর সংজ্ঞাটাই গোলমেলে। ফলে বিভ্রান্তি আসা স্বাভাবিক। ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করে না সে কাফির? কোরান পড়লে তাই মনে হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে কোরান এটাও বলছে উপাসনা নয় সৎ কর্মফলই আল্লার প্রিয়! তাই যদি হয়, আমার মতন লোকেরা যারা সৎ কর্মে বিশ্বাস করে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারা কি বিধর্মী? গীতায় উত্তরটা পরিস্কার। অসাধু এবং অসৎ ব্যক্তিই বিধর্মী। কর্মফলেই ধর্ম, অধর্মের পার্থক্য হয়। কোরান এব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রেখেছে। কারণটা বোধ হয় এই, একাধিক লোক কোরান রচনা করেছেন (যেমনটা ডঃ মির্জা বলেছেন)।

এবার কোরান এবং গীতার মূল বক্তব্য বিশ্লেষন করি। আল্লা/ঈশ্বরের কাছে সম্পুর্ন আত্মসমর্পন। কার? আমার?

আমি কে? আমার সত্বা কি? আমার আত্মসমর্পন বলতে কি বোঝায়?

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে গীতা এবং কোরান সহজে বোঝা যায়। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুধ এবং জলের পার্থক্য করা যায়। যেহেতু এই বইগুলো মানুষের রচনা, ত্রুটিগুলো বোঝা সহজ হয়।

ব্যাপারগুলো একটু জটিল। আমি সহজে আলোচনা করার চেস্টা করছি।

কেও যদি জিজ্ঞেস করে মিঃ রায়হানের সংজ্ঞা কি, উত্তর কি হবে? তার আগে দেখা যাক সংজ্ঞা ব্যাপারটা কি। যে গুনের বর্ণনায় পৃথকীকরন করা যায় তাই সংজ্ঞা। তাহলে রায়হানের সংজ্ঞা কি হবে?

-দেহ?
-মন?

দেহ নয়। কারণ দেহ আজ যা, কাল সেটা থাকবে না। দেশকোষের প্রতি নিয়ত জন্ম মৃত্যু হচ্ছে।

মনও নয়। যে আজ কম্যুনিউস্ট কাল ক্যাপিটালিস্ট হতে পারে।

অর্থাৎ যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, তা দিয়েতো সংজ্ঞা চলতে পারে না!

অর্থাৎ আমার একটা অপরিবতর্নশীল সংজ্ঞা না থাকলে কোরান, গীতা, ধর্ম সবই ভেস্তে যায়!

ঋষিরা 'পরমাত্মা' বলে একটা ভেজাল সৃস্টি করেছিলেন। যার মানে হচ্ছে 'আমার' অপরিবর্তনশীল সত্ত্বা! কোরান আধ্যাত্মিকতায় এত দূর এগোতে পারে নি। সুফীরা পেরেছিলেন। গীতাতেও এই ব্যাপারটার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অতীতের ঋষিরা এটা নিয়েই ভাবতেন, কিন্তু এসবের উত্তর জানতে যতটা বিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়া দরকার, সেটা আগে হয় নি।

প্রশ্ন উঠবে এই সব চাইপাঁশ ভাবার কি কোন কারণ আছে? বৃথা সময় নস্ট? আমি কি সেটা জেনেই বা কি লাভ? এই বেশ ভালো আছি!

লাভ আছে। আমরা মোটেও ভালো নেই। এই প্রশ্নের উত্তর না জানলে, কোরান, গীতার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আর সেটা না হলে, ধর্মযুদ্ধ চলতেই থাকবে। লোকে নামাজ, হজ, তীর্থযাত্রা, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি অর্থহীন ধর্মাচারনে টাকা এবং সময় নস্ট করবে। অন্য ধর্মের লোকেদের পেটাবে, ঘৃণা করবে।

তাহলে আমার অপরিবর্তনশীল সংজ্ঞা কি? জেনেটিক কোড। সেটা ঠিক, কিন্তু এটাও ঠিক, দুজনের জেনেটিক কোড সমান মানেই, দুজন মানুষ সমান হবে না। উদাহরন আইডেন্টিকাল টুইন।

তবুও জেনেটিক কোডই আমাদের অপরিবর্তনশীল সংজ্ঞার কাছাকাছি। শরীর এবং মনের গঠনের অধিকাংশই কোডের ওপর নির্ভর শীল। আমরা চাই আর না চাই, সবাই একটা জৈবিক সারভাইভাল মেশিন। সন্তান সন্ততির প্রতিপালনের মধ্যে দিয়ে, নিজেদের এই অপরিবর্তনশীল আস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছি।

এটা কি ভাবে করা সম্ভব?

প্রথমেই একটা সমাজ চাই, যেখানে (১) আমাদের পরিবারের সামরিক সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। (২) সিস্টেম এমন হওয়া চাই যেখানে পাশবিক প্রবৃত্তিতে আকৃস্ট

হয়ে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃস্টি না হয়। অতিরিক্ত বস্তুবাদ এবং ভাববাদ উভয়ই পাশবিক প্রবৃত্তির কারণ হতে পারে। (৩) এবং ডারউইনের বিবর্তনের সূত্র ধরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সব জেনেটিক কোড দুর্বল, তাদের মৃত্যু হওয়া দরকার। জেনেটক কোডের মৃত্যু মানে, মানুষের মৃত্যু নয়। নতুন প্রজন্মে ছেদ পড়া।

মানব সভ্যতার ইতিহাস আসলে এই সিস্টেমকে পারফেক্ট করার ইতিহাস। সিস্টেমের প্রয়োজন থেকেই ঈশ্বরের কল্পনা। প্রথমে অনেক ঈশ্বর। পরে একেশ্বরবাদ। গীতা এবং কোরানকে এভাবে দেখাটাই যুক্তিসঙ্গত। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে, মহম্মদ সিস্টেমকে ভালো না খারাপ করার চেস্টা করেছেন সেটা নিয়ে কোরান ধরে বিতর্ক চলতেই পারে। তবে ইতিহাস বলছে, শিক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞানে আরবরা কিন্তু এগিয়েছে ইসলামের জন্মের পড়েই। সুতরাং ইসলাম একটা সিস্টেমকে এগিয়ে দিয়েছিল এটা মানতেই হবে।

কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে কোরান, গীতার কি প্রয়োজন আছে? না ধর্মাচারনের কিছু দরকার আছে?

বস্তুত এটা যখন জলের মতন পরিস্কার মুসলমানদের পশ্চাতপসরনের পেছেনে ইসলাম ধর্মের ভূমিকাটাই মূখ্য। ভারতের দারিদ্র্যর পেছনে ধর্ম অবশ্যই একটা বড় কারণ।

ঈশ্বর কে স্মরণ করায়(বা নামাজে) কোন ধর্ম পালন হয় না। পুজোর ক্ষেত্রেও একিই কথা খাটে। কারণ এতে 'আত্মসত্ত্বার' প্রকাশ হয় না। আত্ম অনুসন্ধান হয় না। অনেকে বলে এতে অহংকার কমে, বিনম্রচিত্তের প্রকাশ ঘটে। আমি উলটো দেখেছি। তাহলে ধর্ম সাধনা কি? ধ্যানে লোকে কি করে? আমাদের যেটা বলা হত, ধ্যান মানে, নিজের মনকে পর্যবেক্ষন কর। দেখ মনটা সেক্স চাই, না প্রেম চাই, না ঘৃণা চাই। মনের ফোকাস ক্রমাগত বদলাতে থাকে। সেটাকে ফোকাসে আনাটাই ধ্যানের মূল প্রাথমিক কাজ। এতে মনের শরীর ভালো থাকে এবং এ ব্যাপারে যথেস্ট গবেষনা হয়েছে। মনকে ফোকাসে আনতে পারলে, আত্মসত্ত্বার বিকাশ হয়। এবং আমাদের কর্ম, চিন্তাধারা এবং বাক্যকে সৎ পথে রাখা সম্ভব। যেটা কোরান এবং গীতার মূল বক্তব্য। মন্দির, মসজিদ, নামাজ, হজ, পূজা, তীর্থ কোনটাই আমাদের সৎ হতে সাহায্য করে না। বরং ধর্মোন্মাদরা মানুষ মেরে বলে , ওপর আলার কাজ করেছি, এতেব সাতখুন মাপ। ব্যবসায়ীরা চুরি করে জোর পুজো দেয়। পুজোর ভারী উপাচারে অসৎ কর্মের স্থলন হয়ে গেল আর কি!

সমস্যা হচ্ছে কোরানে এত পরস্পর বিরোধী কথা আছে, ধর্মীয় আচরন ঠিক কি হওয়া উচিত এব্যাপারে সুস্পস্ট কোন বক্তব্য নেই। যে লেখকের যেমন জ্ঞান, তিনি তাই লিখেছেন। গীতা অবশ্য খুব পরিস্কার ভাবে সমস্ত ধর্মীয় আচরন ছেরে, কর্মফলের ওপর জোর দেয়। কোরানেও একটা আয়াত পেয়েছি, যেটার বক্তব্য এক। কিন্তু আরো অনেক আয়াত পাওয়া যাবে, যেখানে ধর্মাচরনের সুপস্ট নির্দেশ আছে। যেটা একেশ্বরবাদের সাথে খাপ খায় না। রচয়িতার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের

ওপর নির্ভর করে, কোরানের আধ্যাত্মিক বক্তব্যও পালটে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয়েছে পরস্পর বিরোধী।

আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যানে আমরা সিস্টেমকে প্রায় পারফেক্ট করে এনেছি বললে ভুল হবে। বিজ্ঞান সিস্টেমকে যেমন পার্ফেক্ট করেছে, বস্তুবাদকেও তীব্র করছে। ফলে ভাববাদ এবং বস্তুবাদের দ্বন্দটা রয়েই গেছে।

সেখান থেকেই ধর্ম টিকে থাকার রসদ পাচ্ছে। বিজ্ঞান যতক্ষন না পর্যন্ত মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলোর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারবে, এই সব উদ্ভট ধর্মীয় আচরন, মন্দির মসজিদ বিতর্ক চলতেই থাকবে। মানুষ পুজো, নামাজ ইত্যাদির মাধ্যমে সময় নস্ট করেই আনন্দ পাবে।

অবশ্য এটাও সত্য অযৌক্তিক কাজেই মানুষ বেশী আনন্দ পায়। তবে আমি আইন করে ধর্মীয় আচরন এবং অনুষ্ঠান বন্ধের পক্ষপাতী। নামাজ পূজা ইত্যাদি উদ্ভট আচরন আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থি। রাষ্ট্রনীতির পক্ষে ভয়াবহ। অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক।

ক্যালিফোর্নিয়াঃ১/২৮/০৬